পশ্চিমবাংলায় যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার অতীত, বর্তমান এবং.....

ডঃ কানাইলাল ঘোষ *

১৯৮৮ সালে যখন জীবন ও জীবিকা পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ীভাবে জড়িয়ে গেল, তখন সরকারের এই বিশেষ দপ্তরটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক কোন ধ্যানধারণা সত্যিই ছিল না; যদিও একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার সুবাদে তা থাকা উচিত ছিল। জীববিজ্ঞানের ছাত্র এবং একজন গবেষক হওয়ার সূত্রে পরিবেশরক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক ভূমিকার কথা জানাকে বাদ দিলে দক্ষিণবঙ্গের কৃষিপ্রধান এক জেলার বাসিন্দা হিসাবে অন্য বহু মানুষের মত – বনদপ্তর গাছ লাগায় আর অন্যরা সেটা নষ্ট করে, বনজঙ্গলে মানুষ শুধু অবসর বিনোদনের জন্য বেড়াতে যায় আর সুন্দরবনে বাঘ এবং উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়ায় গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায় – এই বুনিয়াদী ধারণাটুকুই কেবল ছিল। প্রশিক্ষণ চলাকালীন ক্রমশঃ বনদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সমস্যাগুলির আভাস পেতে লাগলাম, যা বিশেষভাবে প্রকাশ পেল পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান রেঞ্জে প্রশিক্ষণ চলার সময়। ১৯৯০ সালে তখন যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা পুরোমাত্রায় মূর্তি পরিগ্রহ করছে। সবার মুখে একই কথা – মানুষ না বাঁচালে জঙ্গলকে কে বাঁচাবে! তখনই প্রথম লক্ষ্য করলাম যে, একই চেহারা ধুতি-জামা পরে বন সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সভায় বক্তব্য রাখে, আবার লুঙ্গি-গামছা গায়ে জঙ্গল গণলুঠেও অংশ নেয়। হাতেনাতে ধরা পড়ে সরাসরি প্রশ্ন করলে মাথা চুলকে সাফাই দেয় – সক্কলেই তো লিচ্ছে আইজ্ঞা, হামারও তো ফেমেলি আচে বটেক! সত্যিই তো! গাছ লাগানো – দেশ বাঁচানোর মহান স্লোগান ততক্ষণই দেওয়া যায় যতক্ষণ বিকল্প জীবিকা ও জ্বালানীর সংস্থান আছে। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী শুধু গদ্যময়ই নয়, প্রয়োজনে যথেষ্ট নিষ্ঠুরও। আপনি বাঁচলে তবে না পরিবেশের নাম! অনগ্রসর এক জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে নবনির্মিত যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার ভালোমন্দ – দুদিকই প্রত্যক্ষ করেছি। আলোচনাসভায় গিয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে মহুল বা পিয়াল গাছের নীচে খাটিয়ায় ফরেস্টের বাবুদের বসিয়ে প্রায় জোর করে চা-ডিমসিদ্ধ খাওয়ানোর মত ঘটনা বারবার ঘটেছে, আবার বিশ্বাস করে কাজের জন্য অগ্রিম দেওয়ার পর সেই কাজ শেষ করার জন্য হাঁড়িয়া আর ছৌ নাচের আমেজে মাতোয়ারা বন সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের পিছনে হন্যে হয়ে ছোটার অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

এরপর বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে কাজ করতে গিয়ে জঙ্গল রক্ষা থেকে শুরু করে দলবদ্ধ বুনো হাতির উপদ্রব সহ্য করার সময়ও যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকই নজরে এসেছে। বিভিন্ন আলোচনাসভার মাধ্যমে জঙ্গলঘেঁষা গ্রামের মানুষের কাছাকাছি যাওয়া, অনুপরিকল্পনা তৈরী এবং বিভিন্ন কাজকর্ম করার সময় গ্রামবাসীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা – ইত্যাদির ফলে ফসলহানি এমনকি প্রাণহানির পরও ক্ষোভের উন্মত্ততাকে সামলে নেওয়া জনতা বনদপ্তরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ সালের আগে বন সুরক্ষা সমিতিগুলি তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ হাতে পেতে শুরু করেনি। চোখের সামনে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং আংশিকভাবে পুরুলিয়া জেলার শাল এবং রোপিত জঙ্গল একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। উপগ্রহ মানচিত্রে দক্ষিণবঙ্গের সবুজের শতাংশ প্রতি বছর পাল্লা দিয়ে বেড়েছে – যার পিছনে একটা বিরাট অবদান বিভিন্ন স্তরের বনকর্মচারীদের, যাদের একনিষ্ঠ উদ্যোগ দুপক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। তবু সেই খুশির হাওয়াতেও মনের মধ্যে কোথায় একটা খটকা রয়েই গিয়েছিল – এই বৃদ্ধি, এই সমৃদ্ধি কি মানুষের চেতনাবৃদ্ধির ফল, না কি ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের দৃঢ় অনুশাসনও এই সাফল্যের অংশীদার, যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের হাতে এসেছে পল গ্যাটির মত এক সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র!

পরের পর্যায়ে, বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগে কর্মরত অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন বন সুরক্ষা সমিতিগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে ও সময়ে নানা আলোচনাচক্রে মতের আদানপ্রদান হয়েছে। তাদের অসঙ্গত দাবিদাওয়া যুক্তি দিয়ে খন্ডন করার পরে তারা সেগুলি থেকে যেমন সরে এসেছে, তেমনই ভবিষ্যতে জঙ্গলরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। ফলে, অবৈধ কাঠপাচারকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় দলবদ্ধ, উগ্র

ও উন্মত্ত দুষ্কৃতীদের হাতে রেঞ্জ অফিসারের যেমন মাথা ফেটেছে, তেমনি সঙ্গে থাকা সমিতির সদস্যরাও মার খেয়েছে, আহত হয়েছে। তার আগেও জঙ্গলরক্ষা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে কর্মরত বনকর্মচারীরা আহত, ক্ষেত্রবিশেষে নিহত হয়েছেন, কিন্তু কোথাও গ্রামের বাসিন্দারাও জঙ্গলরক্ষায় সামিল হতে গিয়ে মার খেয়েছেন, এমন ঘটনা এর আগে ঘটেনি। এক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতের দিকনির্দেশিকার থেকেও সচেতন মানুষের ঐক্যবদ্ধতাই বেশী করে চোখে পড়েছে। এখানেও খেয়াল রাখতে হবে, উত্তরবঙ্গে বন সুরক্ষা সমিতিগুলির লভ্যাংশরূপে অর্থপ্রাপ্তির বিষয়টি ২০০৮ সালের আগে বিবেচনার মধ্যেই ছিল না; বনবিভাগের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সাময়িক কর্মপ্রাপ্তির এবং অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ আহরণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মত বিশেষ কোন প্রকল্পও তখন চালু ছিল না।

পরের দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর বনদপ্তরের বাইরে থেকেই যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার বিকাশ ও অগ্রগতি দেখার সুযোগ হয়েছে। বনসংলগ্ন এলাকার একই ব্যক্তিকে বন সুরক্ষা সমিতির সদস্য হিসাবে যতটা সচেতন ও দায়িত্বশীল বলে মনে হয়েছে, আদিবাসী সমবায় সমিতির সভ্য হিসাবে ততটাই নির্লিপ্ত ও নির্বিকার লেগেছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার বনসম্পদ চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি জেলাও উপগ্রহ মানচিত্রে ক্রমশঃ সবুজ থেকে সবুজতর হয়ে উঠেছে। বন সুরক্ষা সমিতিগুলি এই সময় থেকেই সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য শতকরা পঁচিশভাগ লভ্যাংশ পেতে শুরু করেছে, যা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রভাবিত করেছে। প্রথমদিকে আশঙ্কা ছিল যে, হাতে হাতে প্রাপ্য টাকা দেওয়ার সময় যখন আসবে, তখন লভ্যাংশের পরিমাণ বিভিন্ন বন সুরক্ষা সমিতিগুলির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, সৌভাগ্যক্রমে তা হয় নি; পাশাপাশি থাকা বন সুরক্ষা সমিতিগুলির মধ্যে বড় আকারের মনোমালিন্য এখনও পর্যন্ত দেখা বা শোনা যায় নি।

এর পরে বীরভূম বনবিভাগে চার বছর কাজ করার সময় বীরভূম জেলার বন সুরক্ষা সমিতিগুলির মধ্যে বন রক্ষার মানসিকতায় এলাকাভিত্তিক পার্থক্যটাও লক্ষ্য করা গেছে। ইলামবাজার ও মহম্মদ বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষ যতটা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে, অন্য জায়গাগুলিতে তেমন হয় নি। কোথাও মধ্যপথাবলম্বী, কোথাও উদাসীন, আবার কোথাও আত্মঘাতী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। জঙ্গলের পরিমাণ কম হওয়ায় লভ্যাংশের অনুপাতও এখানে বেশী নয়। তবু, এই পর্যায়ে বীরভূম ও বর্ধমানে সবুজের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেড়েছে। বেশ কিছু জায়গায় মহিলারাও সচেতনভাবে এগিয়ে এসেছেন। কিছু কিছু করে আত্মনির্ভরশীল গোষ্ঠীও তৈরী হয়েছে। তবে, কেন জানি না বন সুরক্ষা সমিতিগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করে আত্মনির্ভরশীল গোষ্ঠীও তৈরী করাটা যেন ঘরের মধ্যে ঘর তৈরীর মত মনে হয়েছে। একটা প্ল্যাটফর্মের সব সদস্য একইরকম সুযোগ পাওয়ার পরিবর্তে তাতে পার্থক্য এলে পরবর্তীতে তা একতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে ভবিষ্যতই বলবে।

এরপর সাড়ে চার বছর উত্তরবঙ্গে বন উন্নয়ন নিগমে কর্মরত জলপাইগুড়ি জেলার যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান কিছু খন্ডচিত্র পাওয়া গেছে, যা যথেষ্ট আশাপ্রদ। কিছুদিন আগে এক সরকারী নির্দেশনামায় জঙ্গল কাটার পর লভ্যাংশের পনের শতাংশ সংশ্লিষ্ট বনবিভাগের সব বন সুরক্ষা সমিতিগুলির মধ্যে বন্টিত হওয়ার আদেশ জারী করায় ভবিষ্যতে ব্যবস্থাটি আরও আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে মনিটরিং বিভাগে থাকার কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও বনবিভাগগুলিতে ঘোরার সুযোগ হচ্ছে। সর্বত্র প্রকাশ্য না হলেও বিচিত্র সব মেরুকরণের আভাস মিলছে। জঙ্গলের পরিমাণ বাড়ায় কেবল হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণই বৃদ্ধি পায় নি, আরো অনেককিছু বৃদ্ধি পেয়েছে যা জঙ্গলের ভবিষ্যতকে কিছুটা হলেও সংশয়াকীর্ণ করে তুলেছে। যে সব দক্ষ বনকর্মচারীরা একসময় যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন, আজ তাঁরাও যেন আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন। জঙ্গলের সব জায়গা আর আগের মত অবারিতদ্বার নয়; বুঝেশুনে মাপ করে কথা বলা অভ্যাস করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা, এতবছরের চেনা মানুষগুলোও যেন একটু একটু করে দুর্বোধ্য আর রহস্যময় হয়ে উঠছে। সহযোগিতার সেই হাত অনেক জায়গায় এখনও আছে, কিন্তু তাতে যেন আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক বিশ্বাসের সেই সবলতা আর দৃঢ়তা অনুপস্থিত। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থাকে সবসময়ই অরাজনৈতিক

প্রেক্ষাপটে দেখার ও রাখার কথা, হয়ত এতদিন অনেকাংশে তা থেকেওছে। নাহলে জঙ্গলের পরিমাণ বাড়ত না। প্রবাদ আছে, বিপদের দিনে বন্ধু চেনা যায়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখনই সঠিকভাবে বোঝার সময় এসেছে যে গ্রামবাংলার জঙ্গলসংলগ্ন এলাকার মানুষের বন, পরিবেশ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যে চেতনার ক্রমঃবিকাশ আমরা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে দেখে এসেছি তা সত্যিই মনের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত ছিল না কি তা কেবল কিছু তাৎক্ষণিক চাওয়া-পাওয়ার হিসাব, পঞ্চায়েতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব আর প্রশাসনিক উদ্যোগ ও তৎপরতার এক সাময়িক প্রতিফলনমাত্র। আগামী বছরগুলিতে জঙ্গলের স্থিতাবস্থা অথবা দ্রুত উন্নতি-অবনতি - কোনটা আমরা প্রত্যক্ষ করব সেটাই হবে বনদপ্তর, বন সুরক্ষা সমিতিসমূহ এবং সামগ্রিক অর্থে পশ্চিমবাংলার যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার এক চরম অগ্নিপরীক্ষা।